এপ্রিল - জুন ২০১৪ ৩য় পর্ব, ২য় সংখ্যা ISSN 2222-5188

ইনফো

মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

- বিশেষ প্রবন্ধ
- ছবি দেখে রোগ নির্ণয়
- জরুরী পদ্ধতি
- রোগ ও জিজ্ঞাসা
- রোগ ও চিকিৎসা

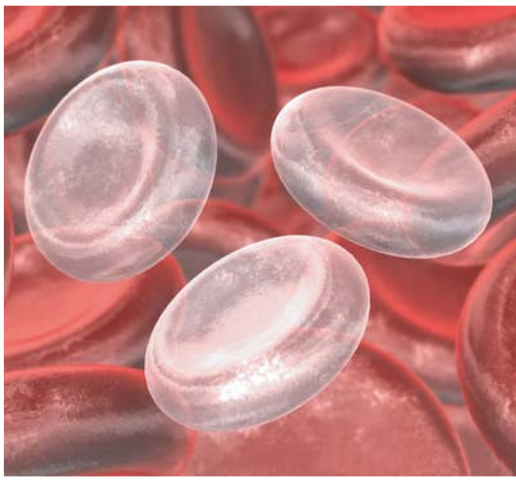

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
ছবি দেখে রোগ নির্ণয়	৫
চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য	৬
জরুরী পদ্ধতি	৮
রোগ ও জিজ্ঞাসা	৯
রোগ ও চিকিৎসা	১০
মেডিকেল জোকস্	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ মোঃ রাসেল রায়হান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

আপনাদের সবাইকে ইনফো মেডিকাস-এর এই সংখ্যাটিতে স্বাগত জানাই। এই সংখ্যাটিকে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিষয়ের সংমিশ্রণে আপনাদের জন্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি নামে পরিচিত সিজোফ্রেনিয়া কি ও কেন হয় এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

ছবি দেখে রোগ নির্ণয় বিভাগে বরাবরের মতো এবারও কিছু নতুন রোগের ছবি সংযোজন করা হয়েছে, যা আপনাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করছি।

গোড়ালি মচকানোতে কি করণীয় তা নিয়ে জরুরী পদ্ধতি বিভাগে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে রোগ সম্পর্কিত নানারকম প্রশ্ন আমাদের মনে উজ্জীবিত হয়, সেসব কিছু প্রশ্নের সঠিক সমাধান আমরা এই সংখ্যার রোগ ও জিজ্ঞাসা বিভাগে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

রোগ ও চিকিৎসা বিভাগে সুপ্ত ঘাতক ব্যাধি ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ-এ প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে যা প্রতিনিয়ত আপনাদের মুখোমুখি হতে হয়।

এই সংখ্যায় মেডিকেল জোকস নামক একটি নতুন বিভাগ সংযোজন করা হয়েছে, যা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ত সময়ের মাঝে কিছুটা প্রফুল্লতা দেবে বলে আশা করছি।

সর্বশেষে ইনফো মেডিকাস-এর পক্ষ থেকে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

সিজোফ্রেনিয়া

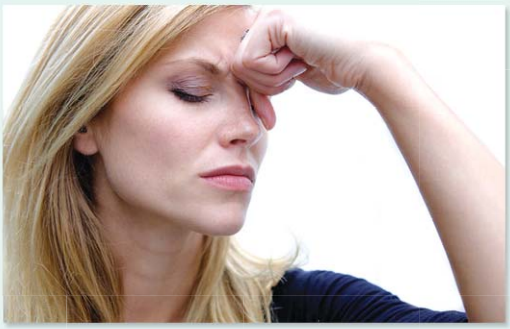

সুইডেনের মনোচিকিৎসক ইউজেন ব্লিউলার ১৯১১ সালে সিজোফ্রেনিয়া শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শব্দটি এসেছে মূলত গ্রিক ভাষা থেকে। এর প্রথম অংশটিকে বলা হয় 'সাইজো' বা সিজো, যার অর্থ ভাঙা বা টুকরো এবং দ্বিতীয় অংশ হলো 'ফ্রেনিয়া' অর্থাৎ মন। কাজেই সিজোফ্রেনিয়ার পুরো শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় ভাঙা মন বা যে মন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মনোচিকিৎসক ব্লিউলার যে অর্থে সিজোকে নিয়েছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল আমরা যা অনুভব করি, আমাদের বোধশক্তি এবং বাস্তবতা। এখানটাতেই সিজোফ্রেনিকদের গণ্ডগোলটা হয়। তারা অনুভূতি বোধশক্তি বা বাস্তবতাবর্জিত চিন্তা নিয়ে কাটাতে চায়। ডা. ব্লিউলার কখনো বলেননি যে সিজোফ্রেনিয়া মানে ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হওয়া। অথচ পরবর্তীতে অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে, এ অসুখটিতে ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে অথবা বহুমুখী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে।

আমেরিকার সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোঅ্যানালিস্ট বা মনোবিশ্লেষকেরা মনে করেন যে, সিজোফ্রেনিয়া হলো কতক আচরণগত অসামঞ্জস্যতা, কোনো পৃথক অসুখ বা রোগ নয়।

যাদের বয়স ২৫-৩০ এর মাঝে তারা সিজোফ্রেনিয়ায় জীবনে প্রথমবার বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। অবশ্য বয়স ৪০ এর ওপরে গেলেও সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। নানা গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শতকরা ১ জন লোক সিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় ১৬ লক্ষ লোক সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত।

কেন এমন হয়?

মানব মস্তিষ্কে নিউরন বা স্নায়ুকোষের পরিমাণ অনির্দিষ্ট, এ সংখ্যাটি বিলিয়ন বিলিয়ন হতে পারে। প্রত্যেকটি স্নায়ু বা নিউরনের শাখা-প্রশাখা থাকে যার সাহায্যে সে অন্য স্নায়ু বা মাংসপেশি বা অন্য কোনো গ্রন্থি থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করতে পারে। নিউরন বা স্নায়ুকোষের শেষাংশে বা টার্মিনাল থেকে কতক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এগুলোকে নিউরোট্রান্সমিটার বা রাসায়নিক দূত বলা হয়ে থাকে। এগুলোর সাহায্যে মূলত নানা ধরনের উদ্দীপনা স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়। সিজোফ্রেনিয়া রোগটিতে ওপরে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা হলো সেটি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের নিউরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গণ্ডগোল থাকে, ফলে তার প্রভাব পড়ে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও তার কাজকর্মে বা আচরণে। এদের প্রত্যক্ষণ বা পারসেপশন ও বোধশক্তি বিঘ্নিত হয়, যার ফলে এদের চিন্তা-ভাবনা ও এদের আচরণ ভুল গন্তব্যের দিকে মোড় নেয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

সিজোফ্রেনিয়া অনেক সময় এত ধীরে ধীরে বিকশিত হয় যে, পরিবারের সদস্য বা রোগী নিজেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন না যে, তিনি এক ভয়াবহ মানসিক ব্যাধিতে জড়িয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের সিজোফ্রেনিয়াকে আমরা বলি ইনসিডিয়াল সিজোফ্রেনিয়া। হঠাৎ করে যদি সিজোফ্রেনিয়া হয়ে যায় এবং উপসর্গগুলো স্পষ্ট থাকে তবে তাকে Acute বা ক্রাইসিস সিজোফ্রেনিয়া বলে। Acute বা হঠাৎ করে যে সিজোফ্রেনিয়া হয় তা সাধারণত তীব্রমাত্রা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই সময় -

- হ্যালুসিনেশন বা অলীক প্রত্যক্ষণ, ডিলিউশন বা ভ্রান্ত বিশ্বাস, চিন্তন পদ্ধতিতে গণ্ডগোল ও নিজের সম্পর্কে অস্তিত্ববোধ বা নিজস্ব অনুভূতিবোধ বিকৃত হওয়া।
- ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং চিন্তনপ্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্যতা থাকা।
- সব বিষয়ে অনীহায় ভোগা, অবসন্ন বা বিষণ্ন থাকা, স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে না পারা। তবে পরপর দুটি এপিসোড বা অ্যাটাক হওয়ার মাঝখানে আবার মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করা।

হ্যালুসিনেশন বা অলীক শ্রবণঃ সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের অনুভূতি বা ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি শাণিত ও তীক্ষ্ণরূপ ধারণ করে। যেসব তথ্য পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, মস্তিষ্কে এক্ষেত্রে সেসব তথ্যকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই এসব তথ্যের তাড়নায় ব্যক্তি যে সাড়া দেয় তা থাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসংলগ্ন। সিজোফ্রেনিকরা এমন কথাবার্তা শুনতে পান যে, তাকে বলা হচ্ছে তুমি এটা কর ওটা কর। অথচ আশপাশে কেউ নেই বা আশপাশে কেউ থাকলেও তারা কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এ অলীক বা গায়েবি আওয়াজকে বলা হয় 'অডিটরি হ্যালুসিনেশন'।

ডিলিউশন বা ভ্রান্ত বিশ্বাসঃ সিজোফ্রেনিকদের অস্বাভাবিক বিশ্বাস থাকতে পারে এবং এতে তারা তাদের বিশ্বাসগুলোতে সব সময় অবিচল থাকে। বিশ্বাসগুলো ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও কালচারাল বা সংস্কৃতিগত এবং শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তথাপি রোগী এতে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। অনেক সিজোফ্রেনিক রয়েছে যারা বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে অন্যরা সমালোচনা বা ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সিজোফ্রেনিয়ার এ ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ধারণাটি প্রবলমাত্রায় থাকে, একে বলে প্যারানয়েড। সহজ বাংলায় সন্দেহবাতিকতা যা স্বাভাবিক সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

চিন্তায় গণ্ডগোল বা অসংলগ্ন চিন্তাধারাঃ সিজোফ্রেনিকরা তাদের চিন্তা-ভাবনাকে সমন্বিত রাখতে পারে না, প্রায়শ তাদের চিন্তা-ভাবনার ধরন থাকে বিক্ষিপ্ত। অনেক সিজোফ্রেনিকের কথাবার্তার পেছনে কোনো যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। আবার অনেকক্ষেত্রে এদের আবেগজনিত প্রকাশ ও সত্যিকার পরিস্থিতি অনেকাংশে খাপ খায় না। যেমন যেখানে হাসা দরকার সেখানে এরা কেঁদে ফেলে এবং উল্টোটাও হতে পারে।

নিজ সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনাঃ সিজোফ্রেনিকরা অনেকাংশে নিজের আমিত্বের অনুভূতিটি বুঝতে পারে না। নিজেকে অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে নিজস্ব অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটে। কতক ক্ষেত্রে তারা মনে করে বা চিন্তা করে তাদের দেহ বা শরীর নিজ থেকে আলাদা বা ব্যক্তি থেকে আলাদা।

আবেগহীন অনুভূতিঃ সিজোফ্রেনিকদের আবেগ, অনুভূতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। চোখ-মুখে আবেগের তেমন কোনো স্পষ্ট প্রকাশ থাকে না। তাদের শরীরের নানা অংশের নড়াচড়াও সীমাবদ্ধ থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই আবেগ এতটাই অবদমিত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা আবেগশূন্যতায় ভোগে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিকরা ভেতরে ভেতরে তীব্র আবেগ অনুভব করে। সিজোফ্রেনিয়ার প্রাবল্য যত বাড়ে আবেগহীনতাও তত সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

বিষণ্নতাঃ সিজোফ্রেনিয়ার সাথে বিষণ্নতা বা দীর্ঘমেয়াদি মাঝারি থেকে তীব্র অবসন্নতা বা দুঃখবোধ থাকতে পারে। এ সময় রোগী নিজেকে খুব অসহায় ও আশাহত মনে করে। বিষণ্নতাজনিত উপসর্গসমূহ কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা কেউ কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারে।

সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়াঃ সিজোফ্রেনিয়াতে যারা অনেক দিন যাবৎ ভোগে তারা ক্রমশ সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিজস্ব মনের ছোট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ভুবনে থাকতে পছন্দ করে। এটি অবসন্নতা বা বিষণ্নভাবের জন্য হতে পারে অথবা একা থাকাটাই নিরাপদ-এ রকম ভ্রান্ত ধারণার কারণেও হতে পারে। সমাজে বসবাসের জন্য আচরণগত যেসব দিক থাকা দরকার তা অনেক সিজোফ্রেনিকের থাকে না।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- মাথার CT scan ও MRI
- ECG

চিকিৎসা

- সিজোফ্রেনিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য না হলেও অ্যান্টিসাইকোটিক বা সাইকোসিসবিরোধী ঔষধ সেবনে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো অনেকাংশে কমে যায়।
- এছাড়া মানসিক প্রশান্তি ও ঘুমের জন্যে ক্লোরপ্রমাজিন (Clorpromazine) জাতীয় ঔষধ সেবন করা যেতে পারে।
- তবে সিজোফ্রেনিক রোগীরা ঠিকমতো ওষুধ সেবন করে ও সাথে সাইকোথেরাপি নিয়ে বেশ সুস্থ থাকতে পারে।

সামাজিক অপবাদ ও সিজোফ্রেনিয়া

সব দেশে, সব সমাজে সিজোফ্রেনিকদের অপবাদ বা মিথ্যা নিন্দা করা হয়ে থাকে। এদের অনেকে সমাজে পাগল বলে আখ্যায়িত করে। অথচ এদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে আখ্যায়িত করা উচিৎ। সিজোফ্রেনিয়া রোগটি সম্পর্কে লোকজনের মাঝে হাজারো ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। সিজোফ্রেনিয়া এমন একটি মানসিক ব্যাধি যাকে ঠিক পুরোপুরি বোঝা যায় না এবং অনেকেই এটি নিয়ে বেশ ভীতিতে ভোগেন। বেশির ভাগ লোক সিজোফ্রেনিয়া সম্পর্কে যে চিন্তা বা ধারণা করে তা আসলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনেক লোক রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত। অনেকে আবার বহুমুখী ব্যক্তিত্ব বহন করে। সাধারণ লোকজন প্রায়শ সিজোফ্রেনিয়াকে আগের ভিন্ন দুটি অবস্থার সাথে মিলিয়ে ফেলেন। অনেকের আবার এ রকম বিশ্বাস আছে যে, সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও হিংস্র। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য সচেতেনতা বৃদ্ধি করা উচিৎ।

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

স্ক্লেরোডারমা

লিম্ফএডেনোমা

ভেনাস আলসার

পেরি অরবিটাল সেলুলাইটিস

পারপুরা

ডিপথেরিয়া

রুবেলা র‍্যাশ

চামড়ার হর্ন

ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সেপটিক আর্থ্রাইটিস

হ্যালো ফেনোমেনন

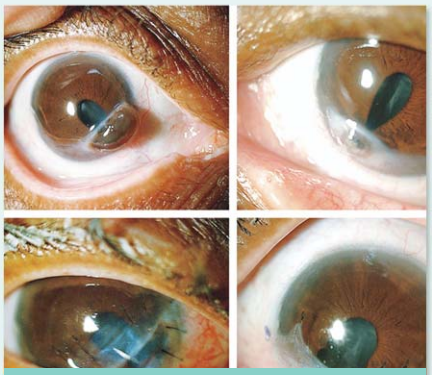

কর্ণিয়াল পারফোরেশন

শিশুর হঠাৎ পেটব্যথা

নবজাতক থেকে শুরু করে স্কুলগামী শিশু প্রতিটি শিশুই পেটব্যথায় ভোগে। পেটব্যথা বা পেট কামড়ানো সাধারণ কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম ও কৃমি সংক্রমণ থেকে শুরু করে স্কুলগামী শিশুর মানসিক সমস্যার কারণেও হতে পারে। শিশুরা আনুষঙ্গিক সব তথ্য ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারে না বলে তাদের পেটব্যথার সঠিক উৎস বা কারণ নির্ণয় করা খানিকটা কঠিনই বটে।

বয়সভেদে ভিন্ন সমস্যা

- নবজাতক শিশুর তীব্র পেটব্যথার গুরুতর কোনো কারণ থাকতে পারে। যেমন অন্ত্রে কোনো অবরোধ, হার্নিয়া, পেরিটোনাইটিস বা গুরুতর সংক্রমণ। তীব্র পেটব্যথা, পেট শক্ত হয়ে যাওয়া, মল বন্ধ হয়ে যাওয়া বা বমি, জ্বর ইত্যাদি থাকতে পারে। জরুরি অবস্থায় অস্ত্রোপচারও লাগতে পারে।
- দুই বছরের নিচে শিশুদের সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ডায়রিয়া, খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রভৃতি কারণে পেটব্যথা হয়। অন্ত্রে প্যাঁচ খাওয়া বা ইনটাসাসেপশন নামের জটিল সমস্যার কারণে এটি হতে পারে।
- বড় শিশু ও বালক-বালিকাদের বেলায় এসব ছাড়া অ্যাপেন্ডিসাইটিস, প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতে কোনো সমস্যার কারণে হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েশিশুদের বেলায় মাসিক-সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই বয়সের বালক-বালিকার বেলায় মানসিক চাপ ও আঘাত, এমনকি বিষক্রিয়ার কথাও মাথায় রাখা উচিত।

কখন সতর্ক হবেন

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে প্রচুর শাকসবজি ও আঁশজাতীয় খাবার গ্রহণে উৎসাহী করে তুলতে হবে। ছোট শিশুদের প্রথম খাবারে অভ্যাস করার সময় একেবারে তরল খাবার না দিয়ে আধা শক্ত চাল-ডাল, সবজি-মাছ-মাংস মিশ্রিত খাবার দেয়া উচিৎ। কোনো খাবারে অ্যালার্জি আছে কি না, খেয়াল করে, সেটি এড়িয়ে চলতে হবে। খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। শিশুদের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তীব্র পেটব্যথা, দীর্ঘ সময় ধরে ব্যথা, বমি, মলের বা বমির সঙ্গে রক্ত, পিত্ত বমি, ওজন হ্রাস ও ব্যথায় অচেতন বা নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকলে সতর্ক হয়ে, দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

শিশুদেরও উচ্চ রক্তচাপ হয়

শিশু যদি স্থূলকায় হয়, ফলমূল ও শাকসবজি এড়িয়ে চলে এবং বাস্তব খেলাধুলার পরিবর্তে অলস সময়কাটাতে বেশি পছন্দ করে, তাহলে অভিভাবকদের সতর্ক হতে হবে। কারণ, এ ধরনের শিশু উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (এআইআইএমএস) প্রায় ১০ হাজার শিশুর ওপর গবেষণার ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। ওই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৩ থেকে ৪ শতাংশ শিশু উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে। আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে পাঁচ বছর বয়সী শিশুরাও রয়েছে।

ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এন্ডো-ক্রাইনোলজি অ্যান্ড মেটাবোলিজম সাময়িকীতে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গবেষণার এক শীর্ষ গবেষক বলেন, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত শিশুদের প্রায় ৭০ শতাংশই প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় রোগটি বহন করবে, যদি না তাদের পরিমিত খাবার গ্রহণ ও শারীরিক সক্রিয়তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এখন শিশুরা দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেই পড়াশোনা ও আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করায় তাদের উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

উচ্চমাত্রায় লবণসমৃদ্ধ খাদ্য বর্জন এবং শারীরিক কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুদের সুস্থ রাখা সম্ভব।

এক্স-রের জানা-অজানা

এক্স-রে

সহজভাবে এক্স-রে হচ্ছে একধরণের কৃত্রিমভাবে তৈরি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, যা দিয়ে মানবদেহের বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিরীক্ষা এবং স্থানভেদে চিকিৎসাও প্রদান করা হয়। এটি রঞ্জনরশ্মি নামেও পরিচিত। ১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিদ ডব্লিউ সি রোয়েন্টজেন এটি আবিষ্কার করেন।

এক্স-রের মাত্রা

রেগুলেশন ১৯৯৯ অনুযায়ী যেকোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ মাত্রা সারা বছরে এক মিলি সিভার্টের অনধিক। তবে যত কম তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কাছে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

এক্স-রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

এক্স-রে শরীরের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। যদিও শরীর অল্পদিনের মাঝেই সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি অপূরণীয়। এতে শরীরের স্থায়ী কোষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মাত্র একটি এক্স-রে কণা, একটি মূল্যবান কোষ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তবে সবসময় সবারই যে একই রকম ক্ষতি হবে বা হবেই এই রকম কোন কথা নেই।

এক্স-রের ফলাফল

যদি মানব ভ্রূণ সৃষ্টির শুরুতে কোন কোষ নষ্ট হয়, এর প্রভাব ওই শিশুটির ওপর পড়তে পারে। শিশুটি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে অথবা হতে পারে মানসিক প্রতিবন্ধি। আবার কারণে অকারণে বারবার এক্স-রে করালে শরীরের জনন কোষগুলোর (শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয়) ওপর এর প্রতিক্রিয়ার কারণে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যারা এক্স-রের সংস্পর্শে থাকেন বা থাকবেন তাদের ত্বকের ক্যান্সার, লিউকোমিয়া, চোখে ছানি পড়া, খাদ্য নালীর ক্যান্সার ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

এক্স-রের প্রয়োজনীয়তা

এক্স-রে একটি অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা যা অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়। আমাদের দেশে যত্রতত্র এর ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই যদি একটু সচেতন হওয়া যায়, তাহলে অনেকাংশে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিনের ব্যায়াম

বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন ধরণের দাপ্তরিক বা অফিসের কাজে নিয়োজিত থাকেন। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষই জীবনে কোনো না কোনো সময় হাড়, সন্ধি, পেশির সমস্যায় আক্রান্ত হন যা তাঁদের দাপ্তরিক কাজের সঙ্গে জড়িত। স্বাস্থ্যকর উপায়ে কী করে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করা যায়, তা নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখা রয়েছে। একে বলা হয় অকুপেশনাল থেরাপি। একজন মানুষ তাঁর কর্মক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন এবং কীভাবে তাঁর শারীরিক গড়ন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে উপযোগী করা যায়, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যাদের দীর্ঘক্ষণ অফিসে চেয়ারে বসে বা কম্পিউটারে এবং বিভিন্ন ধরনের কাউন্টারে কাজ করার অভ্যাস আছে, তাদের জন্য কিছু পরামর্শ। যেমনঃ

- অফিসের চেয়ার-টেবিল ও কম্পিউটারের অবস্থান এমন হতে হবে যেন ঘাড় ৯০ ডিগ্রির বেশি এবং কোমর ৪৫ ডিগ্রির বেশি না ঝুঁকে থাকে।
- টেবিলে কাজ করার সময় কোমর, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি মেঝের সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকবে। কবজি সোজা অবস্থায় টেবিলের ওপর থাকবে এবং ঘাড় শিথিল থাকবে।
- প্রতি এক ঘণ্টা কাজ করার পর চার-পাঁচ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিতে হবে এবং বিভিন্ন অংশ স্ট্রেচিং করতে হবে। ঘাড় সামনে-পেছনে ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত, দুই দিকে ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত এবং কোমর পেছনে ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত স্ট্রেচ করা যেতে পারে।
- প্রতি আধা ঘণ্টা পর পর চোখ কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া ভালো, ১০-১৫ সেকেন্ডের জন্য হাতের তালু দিয়ে চোখ ঢেকে রাখা যেতে পারে।

গোড়ালি মচকানো এবং করণীয়

গোড়ালি শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ জোড়া, যা প্রতিনিয়ত দাঁড়াতে, হাঁটতে, দৌড়াতে ও ওঠানামা করতে ব্যবহৃত হয়। এসব কাজের নিমিত্তেই গোড়ালি সচরাচর মচকানো ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও গর্তে পড়ে গেলে, খেলাধুলার সময়, এমনকি বিছানা থেকে উঠতে গিয়েও গোড়ালি মচকাতে পারে। ইনজুরির তীব্রতার তারতম্যে গোড়ালির লিগামেন্ট বিস্তৃত হতে পারে এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারে। কিছু মচকানো আঘাত অল্প দিন পর ভালো হয়ে যায়। একে তৎক্ষণাৎ (অ্যাকুট) মচকানো বলে। যখন মচকানো ইনজুরি দুই সপ্তাহের বেশি সময় রোগীকে আক্রান্ত করে রাখে, তখন একে ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি মচকানো বলে। মচকানোর ফলে জোড়ায় ব্যথা হয় এবং জোড়া ফুলে যায়। ফোলা ও ব্যথার জন্য জোড়া নড়াচড়া করানো যায় না। পায়ে ভর দিলে ব্যথা বেড়ে যায়।

করণীয়

- গোড়ালিকে পূর্ণ বিশ্রামে দিতে হবে।
- বরফের টুকরা টাওয়ালে বা ফ্রিজের ঠান্ডা পানি প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়ে লাগাতে হবে, এতে ব্যথা ও ফোলা কমে আসবে। প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিনিট বা দুই ঘণ্টা পরপর ২০ মিনিট অনবরত লাগাতে হবে। তবে এটা সহ্যের মধ্যে রাখতে হবে। এ পদ্ধতি আঘাতের ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত চলবে।
- স্প্লিন্ট ব্যবহার করে পা উঁচু রাখতে হবে, এতে ফোলা কম হবে।
- অ্যানালজেসিক বা ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করতে হবে।
- আঘাতের ৪৮ ঘণ্টা পর কুসুম গরম পানির সেক বা ঠান্ডা সেক ব্যবহারে ব্যথা কম হবে।
- গোড়ালির স্বাভাবিক নড়াচড়া এবং পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম করতে হবে।
- দুই-তিন দিন পায়ে ভর না দিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে।
- অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদি ইনজুরির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

চিকিৎসার শুরুতেই ইনজুরির কারণ জানতে হবে এবং সহ্যের মধ্যে রেখে গোড়ালি পরীক্ষা করে রোগের তীব্রতা ও অন্যান্য ইনজুরি, যেমনঃ ফ্র্যাকচার ও জোড়ার ডিসপ্লেসমেন্ট নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ করা যেতে পারে।

- গোড়ালির X-ray
- প্রয়োজনে গোড়ালীর CT scan এবং MRI

কখন হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে

- অসহ্য ব্যথা বা ব্যথা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে।
- আঘাতপ্রাপ্ত গোড়ালি কিছুতেই নাড়াতে না পারলে।
- ফোলা ছাড়াও গোড়ালি বা পা অস্বাভাবিক আকৃতি হলে।
- খুঁড়িয়ে চার কদমের বেশি হাঁটা না গেলে।
- গোড়ালির হাড়ে চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হলে।
- পা ও আঙুলে অবশ ভাব হলে।
- গোড়ালির পেছনে ব্যথা হলে এবং ফুলে গেলে।
- পায়ের আঙুল নিচু করতে অসুবিধা হলে।
- পায়ের পেশিতে ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে।
- চামড়া লাল হয়ে দ্রুত বিস্তৃত হলে।
- ইনজুরির তীব্রতা বুঝতে না পারলে বা করণীয় না জানলে।

রোগ ও জিজ্ঞাসা

কাঁচা লবণ না খেয়ে রান্নায় লবণ বাড়িয়ে দিলে কি রক্তচাপ বাড়বে?

উত্তরঃ উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের কাঁচা লবণ কম খেতে বলা হয়। কিন্তু বুঝতে ভুল করে অনেকেই ভাবেন, রান্নায় লবণ একটু বাড়িয়ে দিলেই সমস্যা মিটে যাবে। আসলে কাঁচা লবণ খেতে বারণ করার অর্থ হলো পরিমিত লবণ খাওয়া ও রান্নায় স্বাদের জন্য যেটুকু দরকার তার অতিরিক্ত না খাওয়া।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে কি ইনসুলিন ছাড়া আর কোনো ওষুধ ব্যবহার করা নিরাপদ?

উত্তরঃ গর্ভস্থ শিশুর জন্য বেশির ভাগ ওষুধই অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ। কেবল ইনসুলিনই প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ হিসেবে প্রমাণিত। তাই অকারণে অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

চোখে ছানি পড়া বা পড়লে তা কীভাবে বোঝা যায়?

উত্তরঃ ছানি পড়া শুরু হলে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সবকিছু ঝাপসা লাগে। একটি জিনিসকে দুই বা ততোধিক দেখা যায়। কখনো কখনো বাতির চারদিকে রংধনুর মতো বর্ণালি দেখা যায়। তবে চোখের লেন্স সম্পূর্ণভাবে ঘোলা হয়ে গেলে তা সাদা দেখা যায়। তখনই সাধারণ মানুষ একে ছানি পেকে গেছে বলে ধরে নেয়।

মাছের ডিম খেলে কি কোলেস্টেরল বাড়ে?

উত্তরঃ মাছের ডিমের প্রায় পুরোটাই কোলেস্টেরল, তাই মাছের ডিম ও মগজ খাওয়া ভালো নয়। তবে মাছ ও মাছের তেল খেলে কোলেস্টেরল বাড়ে না।

নবজাতকের জন্ডিস হলে রোদে দেওয়া কি উপকারী?

উত্তরঃ মেয়াদ পূর্ণ হয়ে জন্ম নেওয়া ৫০ শতাংশ শিশু ও মেয়াদের আগেই জন্ম নেওয়া ৮০ শতাংশ শিশু জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জন্ডিস নির্দোষ প্রকৃতির বা ফিজিওলজিক্যাল এবং ৭ থেকে ১০ দিনের মাথায় কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়। আগে এর চিকিৎসায় শিশুকে শরীরে রোদ বা সূর্যালোক লাগাতে বলা হতো, কিন্তু বর্তমানে বলা হয় যে রোদ লাগালে এতে কোনো উপকার হয় না, বরং সরাসরি সূর্যের আলো শিশুর ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। এই জন্ডিসের প্রধান চিকিৎসা হলো জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করা। তবে জন্ডিস শিশুর জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ডায়াবেটিসে কি মাটির নিচের সবজি খাওয়া নিষেধ?

উত্তরঃ মাটির নিচে উৎপন্ন কিছু কিছু সবজিতে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে, যেমনঃ আলু, কচু, গাজর ইত্যাদি। ডায়াবেটিসের রোগীকে যেহেতু শর্করা কমিয়ে খেতে বলা হয়, তাই তাঁরা এগুলো সীমিত করতে পারেন। তবে পরিমিত খাওয়া মানেই নিষিদ্ধ নয়, এ কথা মনে রাখবেন। আবার মাটির নিচে উৎপন্ন হলেও মুলা, শালগম, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদিতে শর্করা বেশি নয়। তাই মাটির নিচের সবজি মানেই খাওয়া নিষেধ কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়।

টক খেলে ঘা শুকায় না - কথাটি কি ঠিক?

উত্তরঃ অনেকেরই ধারণা, কাটাছেঁড়ার পর বা অস্ত্রোপচারের পর টক জিনিস খেলে ঘা শুকাবে না। কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। ভিটামিন সি দ্রুত ঘা শুকাতে সাহায্য করে। টক ফলমূলে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। তাই কাটাছেঁড়ার পর লেবু, কমলা, মাল্টা, আমলকী, জাম্বুরা ইত্যাদি বেশি করে খাওয়া উচিত।

ছোট শিশুদের কি কৃমির ওষুধ খাওয়ানো যায়?

উত্তরঃ দেড় বছরের আগে সাধারণত কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর দরকার পড়ে না। কারণ এই সময় মায়ের কাছ থেকে পাওয়া রোগ প্রতিরোধশক্তির কারণে কৃমি সংক্রমণ সাধারণত হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করানো উচিত। কৃমি প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার সঙ্গে দুই বছর বয়সের ওপরে পরিবারের সবাইকে ছয় মাস পর পর কৃমির ওষুধ সেবন করা উচিত।

গর্ভবতী নারীরা কি প্রয়োজনে ঘুমের ওষুধ খেতে পারবেন?

উত্তরঃ গর্ভবতী নারীদের ঘুমের সমস্যা প্রায়ই হয়ে থাকে। ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে, পা ব্যথা বা কামড়ানো, কোমর বা পেটে অস্বস্তি, বারবার শৌচাগারে যাওয়া বা গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়ার জন্য ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচলিত প্রায় সব ঘুমের ওষুধই গর্ভাবস্থায় সেবন করা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। এই সময় তাই শিথিলায়ন পদ্ধতি, মনকে চিন্তামুক্ত ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা, ঘুমের আগে বই পড়ার অভ্যাস ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ভালো ঘুম হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গুরুতর সমস্যা হলে ওষুধ দু-একদিনের জন্য খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ

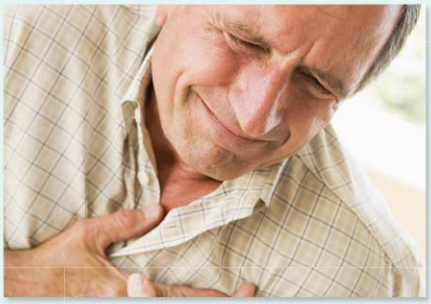

হৃদপিন্ড শরীরের সর্বত্র রক্ত সরবরাহ করে, এই প্রবাহিত রক্তের কাজ খুব সহজ করে বললে হবে সর্বত্র পুষ্টির যোগান দেয়া। হৃদপিন্ডের নিজেরও পুষ্টির প্রয়োজন আছে আর তা আসে মোটামুটি মাঝারী মাপের তিনটি ধমণীর সাহায্যে। এদের নাম যথাক্রমে ডান পাশে রাইট করোনারি আরটারি, মাঝে লেফট এন্টেরিয়র ডিসেন্ডিং, এবং যেটি হৃদপিন্ডকে ঘুড়ে আসে তার নাম লেফট সারকামফ্লেক্স আরটারি। কোনো কারণে যদি এসব ধমণী সরু হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে করোনারি আরটারীর স্টেনোসিস হয়েছে বা ব্লক হয়েছে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ধমণীর গায়ে চর্বি জমে তা ক্রমান্বয়ে সরু হতে থাকে। এটা যদি শতকরা ৫০ ভাগ এর বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে হৃদপিন্ডের রক্ত প্রবাহ মাত্রাতিরিক্ত কমে যেতে থাকে এবং হার্টের কোষগুলো মৃত্যু বা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়- একে মায়কার্ডিয়াল ইশকেমিয়া বলা হয়। ইশকেমিয়া হলে বুকে তীব্র চাপ ও ব্যথা অনুভূত হয় তখন এই সমস্যাটিকে বলে এনজাইনা পেক্টোরিস। এনজাইনা শব্দের বাংলা অর্থ ব্যথা আর পেক্টরিস এর অর্থ বুক। যদি ইশকেমিয়া চলতেই থাকে তবে হার্ট এর কোষ গুলো একসময় মারা যায়, এই অবস্থাটির নামই মায়কার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা MI - যা আমরা প্রচলিত অর্থে হার্ট এটাক হিসেবে চিনি।

মায়কার্ডিয়াল ইনফার্কশন এর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমুহ

- বংশগত।
- বেশি বয়স।
- অতিরিক্ত মোটা বা ওজন।
- বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া।
- কায়িক পরিশ্রম না করা।
- ধূমপান বা মদ্যপান করা।
- অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ।
- ডায়াবেটিস।

লক্ষনসমূহ

- ইশকেমিয়া হলে রোগীর বুকের বাম দিকে প্রচন্ড ব্যথা বা এনজাইনা হয় এবং রোগী বুকে তীব্র চাপ অনুভব করে। অনেক রোগীই অভিযোগ করে যে তার বুকের উপর ভীষন ভারী একটা কিছু চেপে বসে আছে।
- ব্যথার তীব্রতা বুকে বেশী থাকলেও এটা বুক থেকে গলা, গাড়, মাড়ি, কান, বাম হাত এবং আশে পাশে ছড়িয়ে পরতে পারে। একে রেফার্ড পেইন বলা হয়। বুকের ব্যথা ১ থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, তবে এটা কখনই ৩০ সেকেন্ড সময়ের কম দৈর্ঘ্যের হয়না। আবার ১৫ মিনিটের বেশী স্থায়ী হওয়ার নজিরও খুব কম।
- এনজাইনা বা ব্যথা শুরু হয় সাধারণত কোনো একটা পরিশ্রমের কাজ করার সময় যেমন দৌড়ানো বা জোরে হাটা ইত্যাদি।
- ব্যথার সাথে রোগীর অন্য উপসর্গ যেমন শ্বাসকষ্ট, পেট ফাপা লাগা, অস্থির লাগা, বুক ধড়ফর করা ইত্যাদিও থাকতে পারে।
- পরিশ্রম বন্ধ করে বিশ্রাম নিলে এই ব্যথা সাথে সাথে সাময়িক ভাবে কমে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- বুকের ১২ - Lead ECG
- বুকের X-Ray
- সিরাম Troponin I এবং সিরাম CKMB
- Angiogram

চিকিৎসা

- পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।
- ট্যাবলেট Aspirin ৭৫ মি. গ্রা. - ৪ টা একসাথে খেতে দিতে হবে।
- জিহবার নিচে Nitroglycerine স্প্রে করতে হবে।
- পরবর্তী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

প্রতিরোধ

- ধূমপান, তামাক জাতীয় দ্রব্য পরিহার করা।
- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে রাখা।
- কায়িক পরিশ্রম করা।

হেপাটাইটিস সি

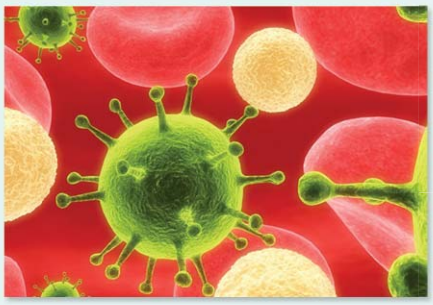

হেপাটাইটিস সি এমন একটি ভাইরাস যা বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংক্রামক রোগের জীবাণু হিসেবে পরিচিত। এ ভাইরাসের ফলে জন্ডিস থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিস এমনকি লিভার ক্যান্সারও হতে পারে । ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। হেপাটাইটিস সি নামক ভাইরাসটি লিভার কোষ ধ্বংস করে ফেলে লিভার প্রদাহের সৃষ্টি হয় ও লিভারের কোষ ধ্বংস অব্যাহত থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, বিশ্বের প্রায় ১৭ কোটি মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত এবং প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও শতকরা ৩ ভাগ লোক হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের বাহক। বর্তমানে বাংলাদেশে পেশাদার রক্তদাতাদের মধ্যে শতকরা ১.২ ভাগ লোক এই ভাইরাস বহন করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘমেয়াদি লিভার রোগীদের মধ্যে শতকরা ২৪.১ ভাগ, লিভার ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯.৬ ভাগ, রক্ত গ্রহণের পর জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬.৮ ভাগ, স্বল্পস্থায়ী জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১.৭ ভাগ রোগী হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত। এইচআইভি বা এইডস রোগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি সংক্রামক হলো হেপাটাইটিস সি।

কিভাবে সংক্রমিত হয়?

হেপাটাইটিস সি রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই সেভিং রেজার, ক্ষুর, ব্লেড, টুথব্রাশ ও ইনজেকশনের সিরিঞ্জ একাধিক ব্যবহার করলেও হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ছড়াতে পারে।

লক্ষণসমূহ

- সাধারণত এ ভাইরাসে আক্রান্তদের ৫-১০ বছরের মধ্যে কোনো লক্ষণ থাকে না।
- অধিকাংশ আক্রান্ত রোগীর ক্ষুধামন্দা হওয়া।
- বমি ও বমি বমি ভাব হওয়া।
- শরীর ম্যাজম্যাজ করা এবং চোখ জ্বালা করা। আহারে রুচি কম থাকা।
- পেটের পীড়ায় ভুগতে থাকা এবং অনেকে সাদা আমযুক্ত মলত্যাগও করা।
- চোখ, চামড়া, জিহবা, হাত, পা এবং নখের হলুদ বর্ণ ধারণ করা।
- তবে এ রোগের দীর্ঘমেয়াদি ফলশ্রুতি হলো লিভার সিরোসিস, লিভার ফেলিউর, রক্ত বমি, পেটে পানি জমা এবং লিভার ক্যান্সার।

হেপাটাইটিস সি রোগের চিকিৎসা

এ ভাইরাসের এখন পর্যন্ত খুব কার্যকরি কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত না হওয়ায় এর প্রতিরোধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক অবস্থায় এ ভাইরাস শনাক্ত করা গেলে এর চিকিৎসা সম্ভব। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারফেরন ইনজেকশন দিয়ে শুরু হয় এ রোগের চিকিৎসা। এসময়ে শতকরা ৫-১৫ ভাগ রোগী চিকিৎসায় দীর্ঘমেয়াদি ভাইরাস মুক্ত হত। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রতিষেধকের মধ্যে রাইবাভাইরিন ক্যাপসুল ও পেগ ইন্টারফেরন আক্রান্ত রোগীদের ভাল হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। এই চিকিৎসার ফলে ৮০ ভাগ ও তদুর্ধ্ব রোগী দীর্ঘমেয়াদিভাবে ভাইরাসমুক্ত হতে পারেন। তবে ইন্টাফেরন চিকিৎসা কার্যকর হওয়া নির্ভর করে চিকিৎসা পদ্ধতি, সি ভাইরাসের জেনোটাইপ, রক্তে সি ভাইরাসের মাত্রা ও অন্যান্য ভাইরাসের উপস্থিতি, লিভারে চর্বি ও আয়রন জমাসহ বিভিন্ন কারণের ওপর। এছাড়া উপসর্গ অনুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসা করতে হবে।

জটিলতাসমূহ

হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ধীরে ধীরে লিভারকে ধ্বংস করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে সে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আজ পর্যন্ত এ রোগের কোনো কার্যকরী ওষুধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি, যা হয়েছে তা অনেক ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত।

প্রতিরোধ

- রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে হেপাটাইটিস সি এর উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য রক্ত দাতার রক্ত পরীক্ষা করা।
- সেলুনে সেভ করা পরিহার করা এবং প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।

- রক্ত নেয়া বা রক্ত জাতীয় পদার্থ (প্লাটিলেট, প্লাজমা) তৈরির ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসমুক্ত রক্ত ব্যবহার করা।
- অঙ্গ সংস্থাপনের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
- ইনজেকশনের যন্ত্রপাতি পরস্পর ব্যবহার না করা।
- ব্যক্তিগত টয়লেট দ্রব্য, যেমন- রেজার, টুথব্রাশ, নেল ক্লিপার এবং ত্বক ফোটানো ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।
- ত্বকে কাটাছেঁড়া, ক্ষত পরিষ্কার রাখা ও ওয়াটারপ্রুফ ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখা।

হেপাটাইটিস সি আক্রান্তদের করণীয়

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করা।
- বাইরের সেলুনে সেভ না করা।
- কাউকে রক্ত বা কিডনি না দেওয়া।

শিশুর রক্তশূন্যতা

লোহিতকণিকা মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের কোষ। এই লোহিতকণিকা ব্রেইনে এবং সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করে। অস্থিমজ্জায় নতুন নতুন লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয় এবং তা রক্তপ্রবাহ স্রোতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তাদের আয়ুষ্কাল হয় ১২০ দিনের। শিশুর শরীরে RBC বা লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে যাওয়াকে শিশুর রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) বলে।

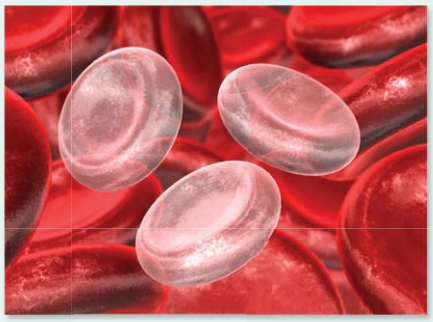

কারণসমূহ

এটি প্রধাণত তিন কারণে হয়ে থাকে। যেমনঃ

প্রয়োজনমাফিক লোহিতকণিকা উৎপন্ন না হলে

- নবজাতক শিশু উচ্চমাত্রার হিমোগ্লোবিন ও লোহিতকণিকা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তবে দুই মাস বয়সে এসে তা নিচু মাত্রায় চলে আসে। এরপর সিগন্যাল পেয়ে বেশি লোহিতকণিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলে। এই সময়ের অ্যানিমিয়া ক্ষতিকর নয়। কোনো ওষুধের চিকিৎসা লাগে না, শুধু মায়ের দুধপানই যথেষ্ট।
- দেহে যখন সুস্থ লোহিতকণিকা তৈরি হয় না, তখনো এ সংকট সৃষ্টি হয়। যেমনঃ আয়রন বা অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে। দুই বছরের কম বয়সী শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালে শিশু অ্যানিমিয়ার প্রধানত আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে কন্যাশিশুর যখন মাসিক শুরু হয়।
- ফলিক এসিড ও বি-১২ ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হয়। শিশু বয়সের আন্ত্রিক অসুখ সিলিয়াক ডিজিজে ভোগা রোগী এ অবস্থায় পতিত হয়।
- অস্থিমজ্জা যখন রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না রক্তাল্পতার লক্ষণ সূচিত হয়। এর নাম এপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া।

দীর্ঘমেয়াদী অসুখে ভুগলে

যখন দীর্ঘমেয়াদী অসুখে ভোগা শিশু রক্তাল্পতায় পড়ে, তখন লোহিতকণিকা ভেঙে যায়, এবং নাম হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এছাড়া নানাবিধ কারণে উৎপন্ন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে লোহিতকণিকা নষ্ট হয়ে যায়। যেমনঃ

- ইনফেকশন, ড্রাগস, সর্প দংশন, বার্ন।
- দীর্ঘদিন যাবত যকৃতের রোগে ভুগা।
- মা বা বাচ্চার ব্লাড গ্রুপে গরমিল থাকা।
- সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া।
- উচ্চ রক্তচাপ, প্লীহা স্ফীতি।

রক্তপাতজনিত কারণসমূহ

- ইনজুরি, বেশি রক্তস্রাব, পাকস্থলী-আন্ত্রিক রক্তপাত।
- কৃমির সংক্রমণ, বিশেষ করে বক্র কৃমি।
- রক্তপাতজনিত অসুখ-হিমোফিলিয়া।

লক্ষণসমূহ

- ত্বকে, ঠোঁটে, হাতে-পায়ের তালুতে ফ্যাকাশে ভাব।
- খিটখিটে মেজাজ, অতিশয় ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা।
- কারণ অনুযায়ী অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া।
- আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়ায় শিশুর অমনোযোগিতা ও দৈহিক বাড়ন ঠিকমতো না হওয়া।
- জন্ডিস, কালো চা রঙের মূত্র, একটুতেই রক্তপাত সমস্যা প্রভৃতি।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- CBC, PBF এবং সিরাম আয়রন।
- হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস।
- Bone-Marrow পরীক্ষা।

চিকিৎসা

শিশুর রক্তাল্পতার কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

- গ্রামাঞ্চলে শিশু বয়সে অ্যানিমিয়ার প্রধান কারণ ঘন ঘন কৃমির সংক্রমণ। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়ানো।
- আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে রক্তাল্পতা হয়ে থাকলে আয়রনসংবলিত ওষুধ খেতে দিতে হবে। শিশুর খাবারে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার বেশি রাখার পরামর্শ দিতে হবে। বেশি দুধপান বা দুগ্ধজাত ফর্মুলার ওপর নির্ভরশীল শিশু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই তার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে।

কৃমিমুক্ত থাকার জন্য করনীয়

- আহারের পূর্বে সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে ফেলা এবং কাঁচা ফলমূল নিরাপদ পানিতে ধুয়ে নেওয়া।
- পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে ফেলা।
- নিয়মিত নখ কাটা ও জুতা ব্যবহার করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।
- একই সময়ে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিবারের অন্য সদস্যদেরও কৃমিনাশক ওষুধ সেবন করতে দিতে হবে।

পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি

পা জ্বালাপোড়া এক বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাকর অনুভূতি, এতে পায়ের পাতা দুটিতে মাঝেমধ্যে মরিচ লাগার মতো অথবা কখনো সুঁই ফোটার মতো কিংবা কখনও ঝিম ঝিম করে বা অবশও লাগে। এ ধরনের অনুভূতির কথা প্রায়ই রোগীদের মুখে শোনা যায় ।

নানা কারণে, এমনকি মানসিক বিপর্যয়েও হতে পারে এই জ্বালাযন্ত্রণা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পায়ের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলেই এমনটা ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি।

কারণসমূহ

- অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস। রক্তে শর্করার আধিক্য ধীরে ধীরে পায়ের স্নায়ুগুলোকে ধ্বংস করে এ ধরনের উপসর্গ সৃষ্টি করে।
- কিডনি ও থাইরয়েড সমস্যায়।
- ভিটামিন বি১২ ও বি১-এর অভাব।
- মদ্যপান।
- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।
- কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় পায়ে জ্বালাপোড়া হতে পারে। যেমনঃ যক্ষ্মা রোগে ব্যবহৃত আইসোনিয়াজিড, হৃদরোগে ব্যবহৃত এমিওড্যারোন, কেমোথেরাপি ইত্যাদি।

তবে সব সময় পায়ে যন্ত্রণা বা জ্বালাপোড়া মানেই যে স্নায়ুতে সমস্যা বোঝায়, তা নয়। আরও কিছু কারণে এ ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। যেমনঃ

- পায়ে ছত্রাক সংক্রমণ।
- পায়ে রক্ত চলাচলে সমস্যা।
- মহিলাদের মেনোপোজের পর।
- অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ।

পরীক্ষা ও নিরীক্ষা

- রক্তের শর্করার পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমনঃ RBS
- সিরাম Creatinine
- সিরাম TSH, CRP

চিকিৎসা

জ্বালাপোড়া হঠাৎ শুরু হয়ে এর সঙ্গে পায়ের আঙুল বা পাতায় অনুভূতি কমে যাওয়া, অবশ মনে হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে অবহেলা করা উচিৎ নয়। পায়ের স্নায়ু ঠিক আছে কি না তা বোঝার জন্য অনেক সময় কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষারও প্রয়োজন নেই। একটি আলপিন বা একটি টিউনিং ফর্ক ব্যবহার করেই পায়ের অনুভূতিগুলো যাচাই করে নেওয়া যায়।

- ব্যথা কমানর জন্য ট্যাবলেট Gabapentine অথবা Pregabaline দেওয়া যেতে পারে।
- ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনের জন্য ওষুধ সেবন করতে হবে।
- ভিটামিন বি১ এবং বি১২ দেওয়া যেতে পারে।
- এছাড়া কারণ অনুযায়ী অন্যান্য রোগের ওষুধ দিতে হবে।

পরামর্শ

- ডায়াবেটিসের রোগীরা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা, পায়ের যত্ন নেওয়া।
- যাদের পায়ের স্নায়ু সমস্যা আছে, তারা পায়ের যেকোনো ক্ষত দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহন করা।
- পায়ে গরম সেঁক নিতে, নখ কাটতে, জুতা বাছাই করতে সাবধান হওয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনফ্লুয়েঞ্জা নাক, গলা ও ফুসফুসের একটি মারাত্মক রোগ। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত "ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস" নামে একজাতীয় ভাইরাস থেকে এই রোগ হয়। শীতকালে এ রোগের প্রকোপ বেশি হলেও বছরের অন্যান্য সময়ও এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এছাড়া এই রোগ সহজেই একজন থেকে অন্যজনের দেহে ছড়িয়ে যেতে পারে বলে অনেক সময় এটি মহামারী (Epidemic) আকারে ছড়িয়ে পরে।

ঝুঁকিপূর্ণ

- পাঁচ বছর বয়সের কম শিশু।
- ৬৫ বছরের বেশি বয়সী বৃদ্ধ।
- অন্যান্য বয়সী যাদের হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি ও যকৃতের সমস্যা আছে।
- যাদের হাঁপানি ও ডায়াবেটিস আছে।
- যাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম।

লক্ষণসমূহ

হঠাৎ জ্বর, শুকনো কাশি, সর্দি, মাথাব্যথা, মাংসপেশি ও গিঁটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ এই রোগের প্রধান উপসর্গ। যদিও এই লক্ষণসমূহ এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়, তবুও মাঝেমধ্যে যারা এই রোগের ঝুঁকিতে থাকে, বিশেষ করে শিশুরা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়; এমনকি তাদের মৃত্যুও হতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে হাত-পা, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

সংক্রমণ পদ্ধতি

- যখন একজন এ রোগে আক্রান্ত হয়, তার হাঁচি-কাশির মাধ্যমে অন্যদের শরীরে এ রোগের জীবাণু ছড়ায়।
- হাতের মাধ্যমেও এই রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- সাধারণত যেখানে জনসমাগম বেশি, যেমন- হাটবাজারে একজনের কাছ থেকে অনেক মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা

- জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে।
- বারবার শরীর স্পঞ্জ করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।
- বেশি করে পানি, শরবত, ফলের রস খাওয়ার জন্য উপদেশ দিতে হবে।
- যদি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর চিকিৎসা দিতে হবে।

প্রতিরোধ

- কেউ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলে তার উচিত যেখানে জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। শিশুদের ক্ষেত্রে স্কুলে না যাওয়া। আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে হাত না মেলানোই উত্তম, অথবা হাত মেলালে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে ফেলা।
- আক্রান্ত রোগী কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় রুমাল অথবা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে নেওয়া এবং বারবার হাত ধোয়া।
- এ ছাড়া এই রোগটি টিকা দেওয়ার মাধ্যমেও প্রতিরোধ করা যায়। এই টিকা আমাদের দেশে পাওয়া যায়। টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং অত্যন্ত কার্যকরী। যেসব শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তি ঝুঁকিতে আছেন, তারা টিকা নিতে পারেন।

ইনফো কুইজ উত্তর জানুয়ারী- মার্চ, ২০১৪

১. খ) ২
২. ক) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন তৈরি হয় না
   খ) অগ্ন্যাশয় হতে অল্প পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি হয়
৩. গ) যাদের ওজন অনেক বেশী এবং যারা মেদবহুল
   ঘ) যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন না
৪. ঘ) ক্ষুধা না লাগা
৫. ক) < ৬.১ মি.মোল/লি
৬. গ) < ৭.৮ মি.মোল/লি
৭. ঘ) উপরের সবগুলো
৮. ঘ) উপরের সবগুলো
৯. খ) ২
১০. ক) ডায়াবেটিক রোগীদের সুস্থতার জন্য খাদ্যভাস নিয়ন্ত্রণ
    খ) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
    ঘ) ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকা

মেডিকেল জোকস্

দীর্ঘজীবী হওয়ার ইচ্ছা

রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব, দীর্ঘ জীবন পাওয়া যাবে এমন কোনো ওষুধ আছে?
ডাক্তার ঃ আছে, বিয়ে করে ফেলুন।
রোগী ঃ বিয়ে করলে দীর্ঘজীবী হব?
ডাক্তার ঃ না, তবে আপনার দীর্ঘজীবী হওয়ার ইচ্ছা মরে যাবে!

চোখের অস্ত্রোপচার

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলেন হরিপদ। চিৎকার করে বললেন, কোথায়? ওই হতচ্ছাড়া চোরটা কোথায়? ডাকুন ওকে। চোখ কপালে তুলে বললেন ডাক্তার, কিসের চোর? কোন চোর? হরিপদ বললেন, আমার এত সুন্দর বিদেশি হ্যাট চুরি হয়ে গেল, আর আপনি বলছেন কিসের চোর?

ডাক্তার ঃ কী করে বুঝলেন, আমার এখানেই চুরি হয়েছে?
হরিপদ ঃ আপনার কর্মচারীদের মধ্যে কেউ আমার হ্যাটটা বদলে দিয়েছে। এটা কিছুতেই আমার হ্যাট হতে পারে না। এটা দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত এবং নকশাটাও জঘন্য।
ডাক্তার ঃ হুম। তার মানে আপনার চোখের অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে।

নিজের নাম মনে করার জন্য

ডাক্তার ঃ কী সমস্যা আপনার?
রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব, আমি সহজে কিছু মনে করতে পারি না। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে।
ডাক্তার ঃ আপনার বয়স কত?
রোগী দীর্ঘক্ষণ আঙুলের কর গুনলেন। মুঠোফোন বের করে ক্যালকুলেটরে কী যেন হিসাব কষলেন, তারপর বললেন, ২২ বছর।
ডাক্তার ঃ আপনার উচ্চতা কত?
রোগী ঃ ব্যাগ থেকে দৈর্ঘ্য মাপার ফিতা বের করলেন, নিজের উচ্চতা মেপে বললেন, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি।
ডাক্তার ঃ আপনার নাম কী?
রোগী ঃ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে দুলে দুলে কী যেন গান গাইলেন, তারপর হেসে বললেন, দুঃখিত, নামটা মনে করে নিলাম। আমার নাম শফিক।
ডাক্তার ঃ ভালো। কিন্তু নিজের নাম মনে করার জন্য কিছুক্ষণ আগে আপনি কী করছিলেন?
রোগী ঃ আমার জন্মদিনে বন্ধুরা যে গানটা গেয়েছিল, সেটা মনে করার চেষ্টা করছিলাম।
ডাক্তার ঃ কোন গান?
রোগী ঃ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ডিয়ার শফিক।

মাথা ব্যথার সমাধান

রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এক ঘণ্টা আমার মাথা ব্যথা করে। সমাধান কি, বলুন তো?
ডাক্তার ঃ এক ঘণ্টার বেশি ঘুমানোর চেষ্টা করুন!

চিঠি

মানসিক হাসপাতালের এক রোগী একমনে কী যেন লিখছেন।
চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। বললেন, কী হে, চিঠি লিখছেন নাকি?

রোগী ঃ হু।
ডাক্তার ঃ কাকে লিখছেন?
রোগী ঃ নিজেকে।
ডাক্তার ঃ বাহ! ভালো তো। তা কী লিখলেন?
রোগী ঃ আপনি কি পাগল নাকি মশাই? সবে তো চিঠিটা লিখছি। চিঠি পাঠাব, দুদিন বাদে চিঠিটা পাব, খুলে পড়ব। তারপর তো বলতে পারব কী লিখেছি!

অন্য কানটা পুড়ল

এক ভদ্রমহিলা গেছেন ডাক্তারের কাছে
ভদ্রমহিলা ঃ ডাক্তার সাহেব, আমার দুটো কান পুড়ে গেছে।
ডাক্তার ঃ হুম, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কীভাবে পুড়ল?
ভদ্রমহিলা ঃ আমি আমার স্বামীর শার্ট ইস্ত্রি করছিলাম। হঠাৎ ফোন এল। আমি ফোন না তুলে ভুল করে ইস্ত্রিটা তুলে কানে লাগিয়ে ফেলেছিলাম।
ডাক্তার ঃ বুঝলাম, কিন্তু অন্য কানটা পুড়ল কীভাবে?
ভদ্রমহিলা ঃ লোকটা যে আবারও ফোন করেছিল!

এসিআই লিমিটেড